বিপন্ন বিস্ময় !

ড. মিলি সমাদ্দার

২০১৩ সনের ১৭ই জুন, অলকানন্দা - মন্দাকিনী - ভাগীরথীর পার্বত্য অববাহিকায় দেড় দিনে স্বাভাবিকের তুলনায় চারশো চল্লিশ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হওয়ায়, অগণিত পূণ্যার্থী, পর্যটক ও বারোটি জনবসতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল! দেবভূমি রাতারাতি পরিণত হয়েছিল মৃত্যুভূমিতে! সাম্প্রতিককালে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার এ নিদর্শন মানব ইতিহাসের যন্ত্রণাদায়ক এক বিপন্ন অভিজ্ঞতা!

মেঘভাঙা বৃষ্টি, ধস্, হড়কাবান, প্রাকৃতিক রোষ উত্তরাখন্ড জুড়ে বেনজির ধ্বংসলীলা ও তুমুল ক্ষয়ক্ষতিতে, কোটি কোটি বছর ধরে তিল তিল করে গড়ে ওঠা সূক্ষ্ম - জটিল অকল্পনীয় বিরাট প্রাকৃতিক সংস্থানের সলিল সমাধি ঘটিয়েছিল নদীগর্ভে। দশদিনের বৃষ্টির পরিমাণ সঞ্চিত হয়েছিল দেড় দিনে। নদীর নিজের গতিপথ সরে গিয়েছিল প্রায় দেড়শো ফুট। পূণ্যার্থী ও পর্যটকদের অনেকেই ১৬ই জুন রাত্রিতে হয়তো লক্ষ্য করেছিলেন চোরাবারিতাল থেকে হিমবাহের ভার নিয়ে গোটা পাহাড়টাই কেমন তীরবেগে ছুটে এসেছিল উন্মত্ত ধ্বংসের মারণতৃষ্ণা নিয়ে! আর অভাবনীয় মুহূর্তে বন্যার চেহারায় জলের ঢেউ প্রায় পনের ফুট উঁচু হয়ে আছড়ে পড়েছে পাহাড়চূড়াসহ কেদারনাথ প্রাঙ্গনের গায়ে।

ভয়ানক বৃষ্টির চাপে ফেটে গিয়েছিল চোরাবালিতাল, যার অন্য নাম গাঁধী সরোবর। সরোবর ছাপিয়ে জলের তুফান আছড়ে পড়েছিল কেদারনাথের পথে, গৌরীকুণ্ড ও মন্দাকিনীর খাতে। ধাক্কা এসে লাগে অলকানন্দা, কর্ণপ্রয়াগ, শ্রীনগর, দেবপ্রয়াগে। বাদ পড়ে না উত্তরকাশীর গ্রাম্য জনপদ যোশীয়াড়াও। বৃষ্টির মহাপ্রলয়ের তান্ডবে যোশিয়াড়াতেই প্রথম চারতলা হোটেল বাড়ি ধূলিসাৎ হওয়ার ছবি টেলিভিশনের পর্দায় জনগণ প্রথম লক্ষ করেছিল, কিন্তু অনুমান করতে পারেনি তার মারণলীলার পরিহাস! ঠিক পরের দিন ১৭ই জুন সংবাদ মাধ্যমে জানা গিয়েছিল জলপ্লাবনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে কেদারনাথ সহ অসংখ্য প্রান্তর! যখন গৌরীকুণ্ড নামটা একটা ইতিহাস! মহাপ্রলয়ের তান্ডবে সেদিন নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে অসংখ্য জনবসতি এবং প্রায় হাজার দশেক মানুষ! আমরা জানি উত্তরাখণ্ডে এই সময়টায় চলে 'যাত্রাকাল'। তাই, দেশের অগণিত পূণ্যার্থী ভিড় করে আসে চারধামের অভিমুখে! (কেদার, বদ্রী, গঙ্গোত্রী এবং যমুনেত্রী নিয়ে

চারধাম) সুতরাং অনুমান করা কঠিন নয় ঘোষিত মৃতের সংখ্যা আপাত গাণিতিক এক পরিসংখ্যান মাত্র! সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, সেই মারণ তান্ডবলীলার মধ্যেও অফুরান প্রাণের শক্তিতে বেঁচে থাকা কতিপয় প্রত্যক্ষদর্শী দেখেছেন, শান্তিদায়িনী বনলতা মন্দাকিনীর জলে মরনের বিভীষিকা! জলতলে বিলীন হ'য়ে গিয়েছে কেদার ও বদ্রীনাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা আদি শঙ্করাচার্যের সমাধি। কেবল হিমালয়ের অনন্ত রূপভৈরবের মধ্যে বেঁচে গিয়েছিল কেদারনাথের মন্দির, যেন প্রাচীন-তত্ত্বের স্মারক!

উত্তরাখন্ডের পার্বত্য অববাহিকায় যে ধ্বংসলীলা মারণ - ইতিহাসের এক ভয়ঙ্কর শক্তি হয়ে উঠেছিল জুন মাসের সতেরো তারিখ, সন দু'হাজার তেরো, তা কি প্রকৃতির খেয়াল না প্রকৃতির প্রতিশোধ? - এ প্রশ্ন বারে বারে তোলপাড় করেছে 'সভ্য পৃথিবী'র পরিবেশ অসচেতন মানুষকেও। পরিবেশবিদ্‌রা জানিয়েছেন অতিবৃষ্টির ফলে এই দুর্ঘটনা তৈরি হয়নি! বৃষ্টির জলের চাপে কানফাটা আর্তনাদে 'চোরাবারিতাল' ফেটে গিয়েছিল এবং হিমবাহের ভার নিয়ে গোটা পাহাড়টা ধসে পড়েছিল পনেরো ফুট উঁচু জলের এক বিশাল ঢেউয়ের সঙ্গে যা নিমেষে মর্ত্যভূমিকে মৃত্যুভূমিতে পরিণত করেছিল তার পিছনে ছিল মানুষের অসচেতন আচরণের অসহায় পরিহাস!

প্রাকৃতিক শৃঙ্খলাকে মানুষ ছিন্ন করেছে বহুমুখী, প্রবল এবং শেষ পর্যন্ত অর্থহীন এক বিজ্ঞাপিত আধুনিকতার উন্নয়নের আগ্রাসননীতিতে। প্রকৃতির ভারসাম্য লঙ্ঘন করে আরও আরও বেশি ক্ষমতা আয়ত্ত করতে চেয়েছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বাজার অর্থনীতি ও মুনাফার প্রশ্ন! অথচ পৃথিবী নামক গ্রহটিতে যে প্রাকৃতিক সংস্থানে মানবপ্রজাতিটি বাস করে, তার প্রতি দায়বদ্ধতা বা সচেতনতা বিন্দুমাত্র অনুভব করার কথা বিবেচিত হয়নি বিপন্ন অস্তিত্বের খাদের কিনারে পৌঁছেও, 'সভ্য পৃথিবী'র ভারতবর্ষীয় জনগণের! আধুনিক ব্যবস্থাপনা গ'ড়ে তোলার সক্রিয় উদ্যোগে ও উদ্দীপনায় সরকারী - বেসরকারী বহু সংস্থা, পর্বতের অন্দরে কন্দরে গুঁজে দিয়েছে ডিনামাইট, পাহাড়কে দিয়েছে গুঁড়িয়ে। গ'ড়ে তুলেছে বাজারী সুবিধাজনক প্রশস্ত পথ, জলবিদ্যুৎকেন্দ্র ও আলোর রোশনাই! সেই তান্ডবলীলায় আশপাশের গ্রাম্য জনপদ থেকে মানুষ শুনতে পায় বিস্ফোরনের পর বিস্ফোরনে আমূল কেঁপে ওঠে পাহাড়! হয়তো তারই উত্তরে ১৬ই জুন রাতে প্রবল গর্জনে সভ্যতার মুখে পদাঘাত করে ফেটে গিয়েছিল 'চোরাবালিতাল'! বাজারী ব্যবস্থা ও দুঃসহ অসচেতনতায় প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা অমান্য করে এবং সূক্ষ্ম স্থিতিস্থাপকতাকে অগ্রাহ্য করে দিনের পর দিন তৈরি হয়েছে প্রকান্ড সব বাঁধ আর জমা জলের বেসামাল ওজন এই

পাহাড়ের বুকে! ছিন্ন ভিন্ন করা হয়েছে প্রাচীন জঙ্গল, আর অন্তর্হিত হয়ে গেছে ঝরনাজাল একে একে, প্রকৃতিকে রক্ষা করবার কোন দায়িত্ব আমরা নিইনি। গঙ্গোত্রী হিমবাহের বরফ গ'লে যাচ্ছে দ্রুত, কারণ বুঝতে পেরেও আমরা উষ্ণায়নের বিপদ সম্পর্কে উদাসীন! পাহাড়ের ঢাল কাঁপছে উঁচু উঁচু হোটেলের চাপে, প্রতিদিন বাড়ছে গাড়ির প্রবাহ আমাদের উন্মত্ত তীর্থদর্শনের মোহে, রাষ্ট্রব্যবস্থাও সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়! নির্দেশিকা অমান্য করে বেশিরভাগ জায়গাতেই বিপজ্জনকভাবে পাহাড় নদীগুলোর অববাহিকা গজিয়ে উঠেছে যথেচ্ছ বাড়িঘর, কিন্তু জনবিস্ফোরনের কোন বন্টনব্যবস্থা নিয়ে কিছুমাত্র সচেষ্ট নয় সরকারী পরিকল্পনা! অথচ এই পার্বত্যভূমি গভীর, গহন, চিরহরিৎ সরলবর্গীয় গাছের আশ্রয়ে আবৃত ছিল ঐতিহাসিককাল ধরে। গাছের শিকড় পাহাড়ের পাথরকে আঁকড়ে থাকত। তখন ঋষিকেশ থেকে কেদারনাথ এই সাড়ে চারশো মাইল পায়ে হেঁটে পথ চলতে পূণ্যার্থী ও পর্যটকদের সময় লাগতো একমাস। পথের দুধারে চটিগুলি ছিল মানুষের দিনান্তের আশ্রয়। পথে ছায়া দিত আম, অশ্বত্থ, পিপুল গাছের সারি। তৃষ্ণা মিটত পাহাড়ি ঝরনার ঠান্ডা জলে! কালিদাস থেকে উমাপ্রসাদ যাঁদের বন্দনাগানে মুখর ছিল সেই ত্রিতাপহরা! এখন হরিদ্বার, ঋষিকেশ থেকে দুদিনে কেদারনাথ পৌঁছানো যায়। কাঠ ব্যবসায়ীদের দাপটে অরণ্য নিশ্চিহ্নপ্রায়, সঙ্গে আছে হোটেল মালিকদের দাপাদাপি! উপরন্তু অধিকাংশ পাহাড়ি নদীগুলির জলধারা রুদ্ধ করে বহু ছোট বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলার সক্রিয় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। পরিবেশ দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন পূণ্যার্থী পিকনিকারদের ফেলা আবর্জনায় গলা পর্যন্ত ভরে গিয়েছিল চোরাবারিতাল! আর কত শান্ত থাকবে প্রকৃতি! আশ্রয়হীনকে সে আশ্রয় দিতে পারে কিন্তু স্বখাত সলিলে ডুবে মরতে চাইলে প্রকৃতি তাকে রক্ষা করবে কোন্ মন্ত্রবলে! অসহায় কান্নায় ভুঁকড়ে ভেঙে পড়া ছাড়া আর কী করার থাকে তার! সভ্যতার লজ্জা ঢাকে তার কান্নায়! তাই, প্রকৃতির খেয়াল নয়, এক বিপন্ন বিস্ময়ে আত্মবলিদানের ইতিহাস নিহিত আছে উত্তরাখন্ডের এই প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলায়।

ঐতিহাসিককাল ধরেই লক্ষ্যনীয় যে, প্রকৃতি ও পৃথিবীর স্বাভাবিক গতিধারা বয় যে নদীর প্রাণপ্রবাহে, সে ধারায় আছে সব মানুষের সমান অধিকার, সেই অধিকার ছিনিয়ে নেয় রাষ্ট্রনীতি বাহুর জোরে। নদীর জলধারা রুদ্ধ করে তৈরি হয় বাঁধ। জলবন্টনের অসম বিভাজনে দেশের কোন অংশ হয় শস্যপূর্ণ আবার কেউ বা থাকে দুর্ভিক্ষপীড়িত, নিরন্ন। পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থায় প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা এভাবেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বারে বারে। এই

অসম ব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টির পরিসরেও প্রশ্ন তোলা হয়েছে ঐতিহাসিক কাল ধরেই বিভিন্ন নাটকে, প্রবন্ধে, কবিতায় গল্পে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুক্তধারা' নাটকেও আছে তেমনি এক সূত্র।

মুক্তধারার উৎসের কাছে কোন ঘরছাড়া মা একটি শিশুকে জন্ম দিয়ে ফেলে রেখে যায়। উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ সেই শিশুর মধ্যে রাজ চক্রবর্ত্তীর সুলক্ষণের ঈঙ্গিত পেয়ে নিজের সন্তানের তুল্য প্রতিপালন করে যুবরাজের স্বীকৃতি দেন। নামকরণ করেন অভিজিৎ। কিন্তু অভিজিৎ জানে পৃথিবীতে সে এসেছে পথ কাটাবার জন্য, পথ রোধ করে অসহায় দরিদ্র প্রজাদের শাসনযন্ত্রে পেষণ করে রাজধর্ম পালন করার জন্য নয়। সে লক্ষ্য করে যন্ত্ররাজ বিভূতি মুক্তধারার ঝরনা বেঁধে তার বুকের উপর মুষল পুঁতে বাঁধ নির্মান করে। শিবতরাইকে দুর্ভিক্ষ কবলিত ও নিরন্ন করে তোলাই তার লক্ষ্য। কোন্ চাষির কোন্ ভুট্টার ক্ষেত জলের অভাবে শুকিয়ে যাবে সে কথা ভাবার প্রয়োজন নেই উত্তরকূটের রাজা ও যন্ত্ররাজের! বহু মানুষের অসহায় প্রাণের বিনিময়ে বহু ক্ষয়ক্ষতির মূল্যে তৈরি এই বাঁধে শিবতরাইয়ের প্রজাদের কঠিন শাসনে রাখার ষড়যন্ত্র রাজার। অভিজিতের জীবনে তাই সে বাঁধ দুঃসহ যন্ত্রণা। তার মন বিদ্রোহে অস্থির হয়! সে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করে যে, এই বাঁধের কারণে শিবতরাইয়ের চাষ বন্ধ হবে, বেঁচে থাকার জলটুকুও তারা পাবে না। অজন্মা আর খরা হবে নিত্যসঙ্গী! অভিজিৎ প্রাকৃতিক যুক্তিবুদ্ধিতে জানে মুক্তধারা প্রকৃতির, সকলের অধিকার আছে সেই জলে। রাজষড়যন্ত্রে, রাজনীতির কূটনৈতিক চালে মানুষের বেঁচে থাকার এই অবলম্বন কেড়ে নেওয়া অন্যায়। সেই বাঁধা দূর করবার জন্য বদ্ধপরিকর সে। অভিজিৎ বিশ্বাস করে 'আমার জীবনের স্রোত রাজবাড়ির পাথর ডিঙিয়ে চলে যাবে এই কথাটা কানে নিয়েই পৃথিবীতে এসেছি'।[১] যন্ত্ররাজ বিভূতির সঙ্গে তাই আছে তার আদর্শের লড়াই। কারণ যন্ত্ররাজ বিভূতি ম'নে করেন, 'দেবতা তাদের কেবল জলই দিয়েছেন, আমাকে দিয়েছেন জলকে বাঁধবার শক্তি।'[২] এক দ্বান্দ্বিক টানাপোড়েনে আমরা লক্ষ্য করি প্রাকৃতিক সম্পদে পৃথিবীর মানুষের সহজ স্বাভাবিক অধিকারের দাবিকে একজন স্বীকৃতি জানাচ্ছে, অন্যজন তাকেই ব্যক্তিগত সম্পদে পরিবর্তন করে দিতে চাইছে পেশীশক্তিকে সম্বল করে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানব ইতিহাসে এই হ'ল চরম দ্বন্দ্ব এবং সংকট।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগ্রাসননীতির চেহারা রবীন্দ্রনাথের কাছে এতটাই প্রত্যক্ষ ছিল, তিনি বারে বারে সে কথাই তাঁর নাটকে, প্রবন্ধে কবিতায় বলে গিয়েছেন। সচেতন করতে চেয়েছেন মানুষকে এবং শঙ্কিত হয়েছেন পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে! অভিজিতের মতন

চরিত্ররা তাঁর সব নাটকেই মানুষের অধিকার, স্বাভাবিক দাবির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছে। তাই, যুবরাজ হয়েও উত্তরকূটের সিংহাসন ছিল তার জীবনস্রোতের বাঁধ। মুক্তধারায় বাঁধ তৈরি হ'লে সে বুঝতে পারে রাজবাড়ি আর তার আশ্রয় বা বিশ্রামস্থল নয়। 'ধরনীর সংগীত রোধ করে দিয়ে আকাশে লোহার দাঁত মেলে অট্টহাস্য করে যে যন্ত্রবাঁধ সেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করার জন্য সে প্রস্তুত।'[৩] রাজবাড়ি ত্যাগ করে অভিজিৎ পথে বেড়িয়ে পড়ে। যন্ত্ররাজ বিভূতি মুক্তধারার গায়ে লোহার শৃঙ্খল পরালে অভিজিৎ বুঝতে পারে এই লৌহযন্ত্রই শিবতরাইয়ের মানুষের বিপন্নতার কারণ হবে। তাই নন্দিসংকটের পথ তাকে খুলে দিতেই হয়। সে বুঝতে পারে শিবতরাইকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি রাজা রণজিতের এক মৌখিক ভাষণমাত্র। এক রাজনৈতিক চাল! স্পষ্ট ভাষায় সে জানিয়ে দেয়, 'ডান-হাতের কার্পণ্য দিয়ে পথ বন্ধ করে বাঁ-হাতের বদান্যতায় বাঁচানো যায় না। দয়ার উপর নির্ভর করার দীনতা আমি, দেখতে পারি না।'[৪] নিশ্চয়ই অভিজিৎ বুঝেছিল রাষ্ট্র রাজনীতির বোঝাপড়ার সম্পর্কে যেমন ঐতিহাসিক কাল ধরে জনসাধারণ যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত হয়েছে, শিবতরাইয়ের অবস্থাও তার ব্যতিক্রম হবে না! তাই, সে হয়ে উঠেছিল সাহসী ও দুর্নিবার। যে পথে অম্বার পুত্র সুমন হারিয়ে গেছে, যেখানে সূয্যি ডোবে, দিন ফুরোয়, সেই অজানিত পথে দুঃসাহসই অভিজিতের একমাত্র সম্বল! এই দুঃসাহস সহ্য করতে না পেরে উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ, রাষ্ট্রনৈতিক চালে ছল করে বন্দী করে অভিজিৎকে। অপরাধ তার, সে নিজরাজ্য বিরোধী। কারণ, রাজার রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার কায়েমের পথে সেই প্রধান বাঁধা। তাই, রাষ্ট্র -রাজনীতির বিরুদ্ধে অধিকার প্রতিষ্ঠা করার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে তার লড়াই। বন্দী অভিজিৎকে মুক্ত করেন দাদাঠাকুর বিশ্বজিৎ। তিনি পরিকল্পনা করে পাকশালায় আগুন লাগান। অভিজিৎ মুক্ত হয়েই সব পিছুটান অগ্রাহ্য করে গহন অন্ধকার পথে পশ্চিমের দিকে ছুটে চলে যেদিকে রয়েছে সেই যন্ত্রবোধ! এই দানবকে ধ্বংস করতেই হবে এই তার পণ। অভিজিৎ জানত বাঁধের দেয়ালে বেশ কিছু দুর্বল অংশ আছে, সেখান থেকেই সে বাঁধ ভাঙবে। তার এও জানা ছিল বাঁধ গুড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জলস্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। প্রাণের এই পিছুটান অগ্রাহ্য করাই তার লক্ষ্য। কারণ, এর ফলে শিবতরাইয়ের সব মানুষ বাঁচবে, তারা আবার জল পাবে, ক্ষেত আবার শস্যবতী হবে। অভিজিতের আত্মবলিদানের সিদ্ধান্ত তাই নিরন্ন মানুষদের জীবনধারনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এক তিমির গহন রাত্রিতে বাঁধ ভেঙে ফেলে অভিজিৎ তার প্রিয় মাতৃধারায় নিজেকে বিলীন করে দেয়। রাষ্ট্র-রাজনীতির ষড়যন্ত্রে বিপন্ন বিস্ময়ে এমনই এক আত্মবলিদানের মূর্ত প্রতীক ছিল অভিজিৎ।

অভিজিতের প্রতিস্পর্দ্ধী সাহসী পদক্ষেপ 'মুক্তধারা' নাটকে আধুনিক সভ্যতার দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করেছে। অভিজিৎ প্রকৃতির সন্তান, মুক্তধারার ঝরনা তার কাছে মাতৃধারা, এই ধারায় সে মাতৃভাষা শুনতে পায়। তাই তাকে শৃঙ্খলামুক্ত করতেই হবে, আর বাঁচাতে হবে শিবতরাইয়ের দুর্ভিক্ষপীড়িত অসহায় মানুষদের। তারাও প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতির সম্পদে তাদের আছে সমান অধিকার। এ অধিকার কোন রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রে লুঠ হয়ে যেতে পারে না, এই ছিল অভিজিতের দর্শন। প্রাকৃতিক লীলার মাঝে অভিজিৎকে বেঁধেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের এই লীলার গান বাঁধা থাকে যে প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার বিন্যাসে, রবীন্দ্রনাথ বহু বছর আগেই সেই ইঙ্গিত পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন মানুষের বোধে, চেতনায়।

রবীন্দ্রনাথের নাটক ও তাঁর দর্শন যে প্রকৃত সমাজবিজ্ঞানের পাঠ, সে সত্য আবার আমরা লক্ষ্য করলাম সাম্প্রতিককালে 'মুক্তধারা' নাটকের এক অন্য বিশ্লেষণে। ২০১৩ সনে সুন্দরবনের বালীদ্বীপে 'আদর্শ বিদ্যামন্দির' স্কুলে 'রণন'- এর নাট্যকর্মীরা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কিছুদিন একটি কর্মশালা করে, যার লক্ষ ছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং একটি নাটক প্রযোজনা করা। এই প্রযোজনায় বেছে নেওয়া হয়েছিল 'মুক্তধারা' নাটক। 'আদর্শ বিদ্যামন্দির' স্কুলের একদিকে দুর্গাদুয়ানি নদী এবং অন্যদিকে বিদ্যানদী। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে আশপাশের গ্রাম ও স্কুলটি যেন ভেসে না যায় তাই দুর্গাদুয়ানি নদীর উপর নির্মাণ করা হয়েছিল বাঁধ। বছর ছয়েক আগে আয়লার দূরন্ত তান্ডবে বাঁধ ভেঙে জল ঢুকে গিয়েছিল স্কুলবাড়ির মধ্যে এবং ডুবে গিয়েছিল একতলা পর্যন্ত। নদীর কাছে যাদের বাড়ি, সেসব ভেসে গেলে প্রাণ বাঁচাতে মানুষজন স্কুল বাড়ির দোতলায় আশ্রয় নিয়েছিল। নোনা জল চাষের জমিতে ছড়িয়ে যাওয়াতে সে বছর চাষ হয়নি, পরের বছরও চাষ খুব কম হয়েছে। এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক অস্থিরতার কারণে দ্বীপবাসী মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নদীবাঁধের উপরই অনেকটা নির্ভরশীল। অশক্ত ও জীর্ন নদীবাঁধগুলোই প্রাকৃতিক ভয়াবহতা প্রতিরোধে দ্বীপবাসী মানুষের বিরাট ভরসা। এই বালীদ্বীপের ছোট ছোট পড়ুয়ারা 'মুক্তধারা' নাটক প্রযোজনার প্রস্তুতি নেয়। আমরা পাঠকেরা জানি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুক্তধারা' নাটকে আছে ঝরনা রোধকারী বাঁধ ভেঙে দেওয়ার গল্প। এক আশ্চর্য দ্বন্দ্ব আছে এই দুই অবস্থানে। সুন্দরবনের চারিদিকে জল নিয়ে যারা বাস করে, রাতদিন নদীর জলের মাত্রার ওপর যাদের নজর রাখতে হয়, বাঁধ ভেঙে দিয়ে অবরুদ্ধ স্রোতকে মুক্ত করার কথা নাটকের প্রযোজনায় ভাবছে তারাই। কিন্তু কেমন

ক'রে, এই আমাদের আগ্রহ। 'মুক্তধারা' নাটকের ওয়ার্কশপের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, নাটকের মূল কাহিনীর সঙ্গে কলাকুশলীরা অনেকেই তাদের নিজেদের জীবনের অনেক মিল খুঁজে পেয়েছিল। উত্তরকূট তাদের দ্বীপ নয়। সুন্দর স্বচ্ছল উত্তরকূট কলকাতার মতো কোনো বড় জায়গা। বরং দারিদ্রপীড়িত উপেক্ষিত শিবতরাইয়ের গল্প তাদের গল্পের কাছাকাছি। সেই গল্পে একমাত্র আধুনিক যন্ত্র হল স্কুলবাড়ির ঠিক পিছনে বিশাল মোবাইল ফোনের টাওয়ার, যা কিনা তাদের বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসী জীবনে বেশ খানিকটা সুবিধা এনে দিয়েছে। নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে অম্বা ছিল তাদের খুব চেনা, কাছের চরিত্র। জঙ্গলে কাঠ বা মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে যাদের বাবা, স্বামী, ভাই বা ছেলেরা কখনো ফিরে আসত না। তখন তাদের মা, স্ত্রী এবং মেয়েরা ওই অম্বার মতন অনেকেই পথে পথে কেঁদে ফেরে অনন্ত দিন ধরে।

প্রযোজনাটি স্কুলের বাঁধানো স্টেজে না হয়ে সামনের সারা মাঠ জুড়ে হল। এককোণে কিছু বালি ও জ্বালানি কাঠ রাখা ছিল, সেটা শিবতরাই। অন্য কোনো পাম্পকল - পানীয় জলের অফুরন্ত উৎস - আর এক সারি গাছ, সেটা উত্তরকূট। স্কুলের পিছনে মোবাইল টাওয়ার হল বিভূতির যন্ত্র। স্কুলবাড়িটা প্রতিমাস্বরূপ ছিল ভৈরবের মন্দির। গোটা চত্বরটাই হয়ে উঠেছিল মঞ্চ। মাছ ধরা জাল, গামছা প্রভৃতি স্থানীয় মানুষদের নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসই ছিল মঞ্চসজ্জার উপকরণ। 'মুক্তধারা' নাটকে উত্তরকূটের রাজা দুটি রাজ্যকে অর্থাৎ উত্তরকূট এবং শিবতরাইকে সমানভাবে দেখেননি। যন্ত্রবাঁধ নির্মাণ করে চাষের জল ও খাবার জল বন্ধ করে দিয়েছিলেন শিবতরাইয়ের। বালীদ্বীপের আদর্শ বিদ্যামন্দিরের পড়ুয়াদের 'মুক্তধারা' নাটকের প্রযোজনায় কলাকুশলীরাও অনুভব করেছিল রাষ্ট্রের অনেক কিছু করার ছিল তাদের জন্য, তাদের কোন সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করেনি রাষ্ট্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেন তাদেরও এই সচেতনতা জাগাতে পারলেন যে, রাষ্ট্র ক্ষমতারক্ষার স্বার্থে জাতীয়তাবাদের ধুয়ো তোলে এবং মানুষের জীবনে একই সঙ্গে নিয়ে আসে অশনিসংকেত। যন্ত্র কীভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতীক হতে পারে একথাও স্পষ্টভাবেই বুঝতে পেরেছিল সেদিন স্কুল পড়ুয়ারা। তাই 'মুক্তধারা' নাটকের প্রযোজনায় যখন তারা বাঁধ ভাঙার তোড়জোড় করে, তখন কোন্ বাঁধ সে সম্পর্কে সংশয় থাকলেও তাদের নিজেদের চেনা নদীবাঁধ বা 'মুক্তধারা' নাটকে ঝরনার গতিরোধ করা বাঁধকে ছাপিয়ে গিয়ে, তারা যেন সবরকম বাধার বাঁধ চূর্ণ করার পথে এগিয়ে যায়।[৫]

মনের আগল খুলে যখন মানুষ দৃষ্টি মেলে ধরে, উপলব্ধি করে পৃথিবীর সঙ্গে প্রকৃতির এবং

রাষ্ট্রের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের পারস্পরিক বিন্যাস, তখন সমাজবিজ্ঞানীর বিশ্লেষণে আমরা গভীরতর স্তরে পৌঁছে বুঝতে পারি আরও — "in considering such revolutions the distinction should always be between the material revolution in the economic conditions of production which can be determined with the precision of natural science and judicial, political religious, aesthetic or philosophy, in short, idological forms in which men become conscious of this conflict and fight if out"[৬] হয়তো তাই, বালীদ্বীপের আদর্শ বিদ্যামন্দিরের স্কুল পড়ুয়ারা 'মুক্তধারা' নাটকের যে স্বতন্ত্র পাঠ নির্মাণ করেছিল তাদের প্রযোজনায়, সেখানে বিন্যস্ত ছিল প্রকৃতির সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্কসূত্রের মৌলিক অবস্থান ও জিজ্ঞাসা।

সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট থেকে বেরিয়ে এসে আবার আমরা যদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অন্য এক ঐতিহাসিক উদাহরণের মুখোমুখি দাঁড়াই, লক্ষ্য করব কেমনভাবে একসময় হারিয়ে গেছে আদি গঙ্গার ইতিহাস।[৭] যে গঙ্গার ইতিহাস ছিল একসময় দক্ষিণবঙ্গের ইতিহাস। যে গঙ্গার মোহনা অঞ্চল জুড়ে প্রাচীন 'গঙ্গারিডি সভ্যতা' র কথা বর্ণনা করা হয়েছিল প্রথম শতাব্দীর গ্রিক ভ্রমণবৃত্তান্তে। এমনকি ঐতিহাসিক তথ্যে একথাও আমাদের অজানা নয় যে, চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যতরী সাগরে যাওয়ার পথও ছিল এই নদী। প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে নৌ-চলাচলের সুবিধার জন্য এখানকার খিদিরপুর থেকে হাওড়ার সাঁকরাইলে সরস্বতী নদীর প্রবাহকে গঙ্গার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল একটি খাল কেটে। (এখনও এই কারণেই এই অংশের গঙ্গাকে লোকে বলে কাটি গঙ্গা)। এর ফলে নৌ-চলাচলের যাত্রাপথ কমে গেলেও গঙ্গার মূলধারা সরস্বতী ও হুগলি নদী বেয়ে চলতে শুরু করল। রূপ পেল আজকের গঙ্গা। আদিগঙ্গা ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে থাকল। গড়িয়ার দক্ষিণে আদিগঙ্গা এখন স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে খাল-পুকুর-দিঘি হয়ে রয়েছে। এই আদি গঙ্গার বুকের উপর দিয়ে মাঝনদী বরাবর কুড়ি মিটার তফাতে তিনশো চওড়া স্তম্ভ গেঁথে অলস কলকাতাকে মেট্রো রেল দিয়েছে গতির ডানা। আদিগঙ্গার মৃত্যু ঘোষণা করে দেওয়া হ'ল এই প্রকল্পে। তাই শেষ পর্যন্ত আদালতই ভরসা। হাওড়ায় গণতান্ত্রিক সমিতির সুভাষ দত্ত মেট্রো প্রকল্পের বিষয়ে ২০১১-এর মার্চ মাসে একটি জনস্বার্থ মামলা করলেন কলকাতা উচ্চ আদালতের গ্রিন বেঞ্চে। কিন্তু যুক্তি - তর্ক - আবেগ সব থমকে দাঁড়াল এক হাস্যকর আইনের প্যাঁচে। আমরা জানি নতুন রেলওয়ে আইন তৈরি হয়েছিল ১৯৮৯, যে ধারায় বলা আছে রেলওয়ের কোন নির্মাণ কার্যের জন্য অনুমতি প্রয়োজন হবে না। সমস্যা হল

যেহেতু পরিবেশ আইন চালু হয় ১৯৮৬ সালে কিন্তু রেলওয়েজ আইন ১৯৮৯ সালে, সেই কারণে পরবর্তী আইন হিসাবে রেলওয়েজ আইনই অগ্রাধিকার পাবে! সুতরাং ঐতিহ্যবাহী একটি নদীকে ধ্বংস করে আরম্ভ হ'ল মেট্রো রেলের কাজ! তিনশো মূষল ধরে এখন আদি গঙ্গা একটি শহরের নালা; নিথর স্তম্ভরাজির বোঝা নিয়ে এখন নিশ্চল আদি গঙ্গা। এরপর কিছু পর পর রয়েছে মেট্রোর স্টেশন সেখানে আদিগঙ্গা প্রায় অদৃশ্য, যেখানে চির অন্ধকার কেড়ে নিয়েছে নদীর প্রাণ। শহরকে উন্নত এবং আধুনিক করার পথে এই গঙ্গা কি সত্যিই কোন বাধা ছিল? সম্ভব ছিল না কি এই স্রোতস্বিনীর কোন সংস্কার। প্রাণপ্রবাহ কি একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া ছিল একান্ত পথ? এই প্রশ্নগুলি পার্বতীচরণ ভট্টাচার্যের মতন শহরের কতজন মানুষ জানতে চেয়েছেন সন্দেহ। অথচ এই পৃথিবীতেই দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওল শহরের বুকে চেঙ্গিচোন নদীর পুনরুদ্ধারের কথা আজ সকলের জানা। প্রায় বারো বছর আগে এই নদীটি ছিল না, সেখানে ছিল কয়েক মাইল লম্বা রাজপথ আর তার উপরে ছ'লেনের প্রশস্ত ফ্লাইওভার। যার নীচে ফল্গুধারার মতন অন্তঃসলিলা ছিল এই চেঙ্গিচোন নদী। এই নদীটি ছিল একসময় সিওল শহরের উত্তর (যেখানে ধনীরা বাস করে) এবং দক্ষিণের (যেখানে দরিদ্ররা বাস করে) জলবিভাজিকা। সিওল শহর ধনে মানে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুদন্ড ঘোষিত হয়েছিল সেই নদীর। কিন্তু নদী তো হারিয়ে যায় না। ২০০২ সালে সিওলের মেয়র সেই নদীর পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব অনুভব করলেন। রাজপথ, উড়াল পুল সব ভেঙে ফেলা হ'ল, ভেঙে ফেলা হল কয়েকশো মহাস্তম্ভরাজি। পিচ আর কংক্রিটের পাষাণে তৈরি রাস্তা খুঁড়ে পাতাল থেকে ফিরিয়ে আনা হল আট কিলোমিটার দীর্ঘ নদীকে। ২০০৬ সালে বইতে শুরু করল চেঙ্গিচোন নদী, শহরের মাঝখানে সবুজ পাড়ের এক ছোট নদী। ৩২টি ছোট বড়ো সেতু তৈরী হল এপার ওপার যাওয়ার। দু'পাশের পরিবেশ পাল্টে গেছে নদী ধারায় স্নিগ্ধস্নাত হয়ে। সিওল শহরে পঞ্চাশ বছর পরে আবার আট কিলোমিটার জুড়ে নদী প্রাণ ফিরে পেয়েছে।[৮]

আমরা পারব কোনদিন এভাবে আমাদের মজে যাওয়া, মৃতপ্রায় নদীগুলিকে ফিরিয়ে আনতে? উত্তরাখণ্ড জুড়ে ২০১৩ সালের অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর প্রবল তান্ডবে যে ধ্বংসলীলার সাক্ষী আমরা, কখনো ভেবেছি সেখানেও মূল গঙ্গার স্রোত কেমন ভাবে হারিয়ে গেছে! হিমবাহ থেকে নিজের পথ গড়ে নিতে নিতে নদী যেভাবে সমতলে নেমে আসে শস্যপূর্ণ বসুন্ধরাকে আরও ফলবতী করে তোলার আকাঙ্খায়, নাগরিক সভ্য পৃথিবীতে তার কোন মূল্য, কোন দায়িত্ব আমাদের চেতনায় আজও অনুপস্থিত। অথচ

প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে চোরাবারিতালকে প্লাস্টিক আর আবর্জনায় ভরিয়ে তুলতে থাকায় মাত্র দেড় দিনের মাত্রাতিরিক্ত বর্ষণে জলস্তম্ভ যখন আর রোধ করা যায় না, তাল ফেটে পড়ে প্রবল যন্ত্রণায়, তখন তাকেই আমরা বলি প্রকৃতির প্রতিশোধ।

শেষ পর্যন্ত তাই একটি প্রশ্নের মুখোমুখি আজ আমরা দাঁড়িয়ে, তা হ'ল প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা রক্ষা। আমরা ভুলে যাই, এই নীল সবুজ গ্রহটিই মানুষের একমাত্র বাসস্থান। তার অন্তরে অন্দরে আছে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার প্রশ্ন। সেই শৃঙ্খলাকে ছিন্ন করে আমরা মানুষ প্রজাতিকে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে চলেছি প্রতিনিয়ত। আশ্চর্যজনকভাবে এর পরেও আমরা সচেতন হইনা বড় বড় বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত হয়েও। তা নাহলে মাত্র এক বছরের মধ্যেই মন্দাকিনীর অন্য পার দিয়ে কেদারশৃঙ্গে পূণ্যার্থীদের পৌঁছে দিতে অন্য পথ প্রবল দ্রুততার সঙ্গে নির্মাণের কাজ শেষ ক'রে ফেলতে পারত না সরকারী সমর্থনে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তারা। দূভার্গ্যজনকভাবে প্রাকৃতিক শৃঙ্খলারক্ষার শর্ত অচিরে বিস্মৃত হয়ে গেল জনগণ। আবার সেই একই আঘাত। একই আগ্রাসন। ঠিক যেমন পরিবেশ সংক্রান্ত কোনো নিয়মকানুন না মেনে আদিগঙ্গার খাতের উপর মূষল পুঁতে মেট্রো রেলের প্রকল্পকে স্বাগত জানানো হয়েছিল কলকাতা মহানগরীকে সৌভাগ্যবান করে তোলার লক্ষ্যে।

প্রাকৃতিক সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার সময় হয়ত আর নেই। বুঝতে হবে রাষ্ট্র শেষপর্যন্ত মানুষের জীবনরক্ষার দায়িত্ব নেয় না। প্রাকৃতিক শৃঙ্খলারক্ষার প্রশ্নও সেখানে নেই। পৃথিবী জুড়ে কেবল শাসন চালাচ্ছে বাজার ও পেশীশক্তি। তাই, বিপর্যয়ের কারণ কেবল মেঘভাঙা বৃষ্টি, ধস, হড়কাবান বা আয়লা নয়, সংকটের মূল কারণ মানুষের স্বার্থন্ধ অসচেতনতা এবং অসহায় নীরবতা। যে জল তৃষ্ণা মেটায় সেই জলে মরনের বিভীষিকা মানুষকে যখন দেখতে হয়, তখন দায়িত্ব নিতেই হয় এ দায় নিজেরও। সচেতনভাবে অসচেতনতাকে লালন করার অবকাশ আর মানুষের নেই, কারণ অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

আমরা ভুলতে বসেছি পৃথিবীতে মানব প্রজাতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই বেঁচে থাকে, জীবনযাপন করে, নিজেদের জীবনকে নতুনভাবে আবিস্কার করে এবং ব্যাখ্যা করে। 'সভ্যতা' যে শব্দটির অর্থে আমরা নিজেদের আধুনিক ও উন্নত করে তুলেছি এবং তার জন্য যে ক্রমাগত বিভিন্ন আবিষ্কার ও চর্চা মানুষকে আজ নতুনভাবে বাঁচতে শিখিয়েছে, তা সম্ভব হয়েছিল প্রকৃতি ও পৃথিবীর নানা সম্পর্কের বিন্যাস বিশ্লেষণের সূত্রে। বিজ্ঞানী

কোপার্নিকাস (১৪৭৩ - ১৫৪৩) রেভেলিউশন্ অফ দ্য সেলস্টিয়াল স্টিয়ারস ১৫৪৩), নিউটন (১৬৪৩ - ১৯২৭) নিউটনস্ ল অফ মোশন্ এবং নিউটনস্ ল অফ গ্রাভিটেশন্, গ্যালেলিও (১৫৬৪ - ১৬৪২) গ্যালেলিয়ান স্যাটেলাইট বা হাইড্রোস্ট্যাটিক ব্যালান্স এবং আইনস্টাইন (১৮৭৯ - ১৯৫৫) ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট বা রিলেটিভিটি থিয়োরী, এঁদের আবিস্কারের পথ ধরে আমরা পৃথিবীর ভরকেন্দ্র ও গতিসূত্র বিশ্লেষণের পরিক্রমা লক্ষ্য করি। বিজ্ঞানীদের সূত্র বিশ্লেষণে আমরা জেনেছি পৃথিবীতে প্রাকৃতিক শৃঙ্খলারক্ষার যুক্তিসঙ্গত কার্যকারণ সম্পর্ক এবং সংকট ও উত্তরণের উপায়। তাই, কোপার্নিকাসের নিষ্ঠুর অসহায় মৃত্যুর পরেও 'গ্যালেলিয়ান স্যাটেলাইটে' দেখা বৃহস্পতির অবস্থান বা গতিধর্ম কিন্তু চার্চের পোপদের অনুশাসনে মিথ্যে হয়ে যায়নি। বরং মানুষের জ্ঞান নতুন দিশা পেয়েছে। এঁদের মতন সমাজবিজ্ঞানীরাও নানা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে মানুষকে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন আর এক সত্যের সন্ধানে, যেখানে মানুষ রক্ষা করতে পারবে নীল-সবুজ গ্রহের পৃথিবীটাকে, নিজেদের অস্তিত্বকে। যেখানে বিশ্বাস করবে দেশের নাম পৃথিবী। সমাজবিজ্ঞানী এঙ্গেলস্-এর একটি ব্যাখ্যা এই সূত্রে প্রাণিধানযোগ্য। ...state interference in social relations becomes in one domain after another, superflous, and then dies out of itsels, the government of persons is replaced by the administration of things, and by the conduct of process of production. The state is not "abolished", it dies out ..."[৯]

সমাজবিজ্ঞানের এই পাঠ আমরা পেয়েছিলাম আজ থেকে প্রায় একশো সাঁইত্রিশ বছর আগে। এই তত্ত্বে রাষ্ট্র এবং পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের আগামী দিনের সম্পর্ক ও অবস্থানের দিকটি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। এই তত্ত্ব ব্যাখ্যার বহু বছর বাদে সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর একটি বিশ্লেষণ আমাদের আরও সজাগ করে তোলে। ''রাষ্ট্র একটা যন্ত্র হলেও তার অন্তর্গত প্রজাসমূহ যন্ত্র নয় — তারা মানুষ — পাঠ্য বইয়ের কাল্পনিক 'economic man' বা 'political man' নয় — রক্তমাংস হৃদয় - মন - সম্পন্ন জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গ মানুষ তারা শুধু খেয়ে পরে বাঁচতে চায় না, শুধু কম দামে মাল কিনে বেশি দামে বেচতে চায় না, চায় প্রকাশিত হতে, আনন্দিত হতে, দুঃখ পেতে, ত্যাগ করতে।''[১০]

তাই, শেষ পর্যন্ত আমরা বিশ্বাস করি ''সমগ্র দেশ বলে একটি জিনিস সমস্ত দেশের লোকের সৃষ্টি। এই সৃষ্টি তার সমস্ত হৃদয়বৃত্তি ইচ্ছাশক্তির প্রকাশে। এ হচ্ছে যোগলব্ধ ধন।

অর্থাৎ যে যোগের দ্বারা মানুষের সকল বৃত্তি আপন সৃষ্টির মধ্যে সংহত হয়ে রূপলাভ করে। যোগ নয়, সর্বশক্তির যোগ চাই।''[১১]

বাস্তবিক এই 'সর্বশক্তির যোগ' ও সচেতনতা থেকেই একদিন অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে নিশ্চিতভাবে আমরা প্রকৃতি ও পৃথিবীর সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্কের মৌলিক শৃঙ্খলাটি হয়তো রক্ষা করতে পারব। যখন আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন না কোন 'বিপন্ন বিস্ময়।'

তথ্যসূত্রঃ

১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'মুক্তধারা', মহামায়া বুক এজেন্সী, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, আশ্বিন ১৪২০, পৃ.২১।

২. ঐ, পৃ. ৭।

৩. ঐ, পৃ. ২২।

৪. ঐ, পৃ. ২৪।

৫. দত্তগুপ্ত শর্মিষ্ঠা, মুখোপাধ্যায় শিপ্রা, রবীন্দ্রনাথের খোঁজে সুন্দরবনে, 'আরেক রকম', সম্পা, অশোক মিত্র, প্রথম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, ১ জুন, ২০১৩, পৃ. ৪৯ - ৫৪।

৬. Karl Marx, Preface, 'to a contribution to the critique of political Economy'. Progress Publishers, Moscow, 1989...

৭. রায়, মোহিত, 'আদিগঙ্গা', 'নবপত্রিকা', ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১২, রবিবার।

৮. ঐ, পৃ. ৫

৯. Engles, Fredrich, Anti -Duhring, Marxists Interest Archive, 1996. https// wwwgoogleco.in/url,url-httpsllwwwmarixtist.org/archive/marx, works,pg.199.

১০. (সংগৃহীত তথ্য সূত্র) 'প্রতিদিন', 'ছুটি', রবিবার, ১৪ জুলাই ২০১৩

১১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'সত্যের আহবান', কালান্তর, রবীন্দ্ররচনাবলী, ষষ্ঠ খন্ড, সুলভ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৯৫ঃ ১৯১০ শক, বিশ্বভারতী, পৃ. ১৯৮।

সহায়ক সংবাদপত্রঃ

ক) 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ২৪শে - ২৬শে জুন ২০১৩, কলকাতা, সোমবার - বৃহস্পতিবার।

খ) 'এই সময়', ২৪শে - ২৮শে জুন ২০১৩।